রবীন্দ্র প্রবন্ধে নারী

বন্যা আহমেদ

সেপ্টেম্বর ২৫, ২০০৫

একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষন করলেই দেখা যাবে যে, তিনি যতখানি প্রভাবিত ছিলেন ভিকটোরিয়ান সামন্ততান্ত্রিকতা দিয়ে তার চেয়ে আসলে অনেক বেশি প্রভাবিত ছিলেন সনাতন হিন্দু ধর্মের সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়ে এবং উপনিষদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়ে। গীতা বলছে, তোমার জন্ম পুর্ব-নির্ধারিত, তুমি যে জাতে জন্মাবে সে জাতের কাজ করাই হচ্ছে তোমার ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের মুখে কি আমরা নারী সম্পর্কে প্রায় একই কথা শুনছিনা? প্রকৃতিই তোমাকে তৈরি করেছে দুর্বল করে, দাসী করে, এর বাইরে তুমি বেরুবে কি করে, এটাই তোমার ভাগ্য, এটাই তোমার ধর্ম, এই দাসত্বকে খুশি মনে মেনে নেওয়াতেই তোমার মংগল। ... কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই নারীবিরোধী অবস্থানের কিছুটা পরিবর্তন দেখতে পাই তার শেষ বয়সে লেখা *নারী* প্রবন্ধে। হুমায়ুন আজাদ সে সম্পর্কে সঠিকভাবেই বলেছেন, 'প্রবন্ধটিতে পাই দুই রবীন্দ্রনাথকেঃ এক রবীন্দ্রনাথ পিতৃতান্ত্রিক, যিনি নারীকে মনে করেন প্রকৃতির অভিপ্রায় বাস্তবায়নের মাংসল যন্ত্র, যার কাজ সন্তান ধারণ পালন, যে বইছে 'আদি প্রনায়ের সহজ প্রবর্তনা' নিজের স্বভাবের মধ্যে; আরেক রবীন্দ্রনাথ, অনেকটা বাধ্য হয়ে মেনে নেন যে নারীকে বেড়িয়ে আসতে হবে বাইরে।... ...

নারী শিক্ষা, *নারীবাদ* আর *নারী স্বাধীনতা* - মনে হচ্ছে অনেকেই গুলিয়ে ফেলছেন এই তিনটি শব্দের মধ্যে, কেউ বলছেন রবীন্দ্রনাথ নারীশিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছেন তাই তিনি নারীবাদী, কেউ বলছেন রবীন্দ্রনাথ বিশাল নারীবাদী লেখক ছিলেন, কেউ বলছেন তার লেখায় নাকি নারী স্বাধীনতার মশাল জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, কেউবা তার মানবতাবাদকে নারীবাদ বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এই তিনটি শব্দ ছাড়াও আরেকটি শব্দের অর্থ নিয়েও মনে হয় একটু সমস্যা আছে সবার, আসলে 'প্রগতিশীল' কথাটার মানে কি? সময়ের লিটমাস টেষ্টে কে আসলে প্রগতিশীল, কে নয়, কে সেটা নির্ধারণ করে দিবে? রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন উঠলেই সবাই বলে ওঠেন তাকে তার সময়ের গন্ডীতে বিচার করতে হবে, এটা তো খুবই খাঁটি কথা! আমার তো মনে হয় না এই কথাটি ভুলে গিয়ে কারও লেখা নিয়ে গঠনমুলক সমালোচনা বা আলোচনা করা সম্ভব। আমি নিশ্চয়ই আজকে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে নারীর গর্ভপাতের অধিকার কিংবা সমকামী নারীর অধিকার (লেসবিয়ান বা অ্যাবোরশান রাইটস) নিয়ে নারীবাদী কোন আলোচনা আশা করব না! নারীবাদ একটি তত্ত্ব বা মতবাদ, সেটাকে একেকজন একেক ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন, আর নারী মুক্তি হচ্ছে তারই একটি অংশ, যাকে অবশ্য অনেক সময়ই নারীবাদের লক্ষ্য বলে মনে করা হয়। কিন্তু নারী শিক্ষার সাথে নারীমুক্তির একটি পরোক্ষ সম্পর্ক থাকলেও এটি কোনমতেই নারীমুক্তির পরিপুরক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। কেউ নারী শিক্ষার প্রবর্তক হলেই নারীবাদী বা নারী মুক্তির পক্ষের শক্তি হয়ে যাবেন এমন কোন কথা নেই।

এখন আসা যাক আসল রবীন্দ্রনাথ এবং নারী প্রসঙ্গে। একটি ছোটো ঘটনা বলি, আশির দশকের মাঝামাঝি, আমার তখন ১৪-১৫ বছর বয়স, ঢাকার মহিলা সমিতি মঞ্চে নাটক দেখাটা তখন এক ধরনের ফ্যাশান হয়ে দাড়িয়েছে, মা'র সাথে রবীন্দ্রনাথের *শাস্তি* ছোটগল্পের নাট্যরূপ দেখতে গিয়েছি। শেষ দৃশ্যটা এখনও মনে আছে, ফাঁসির দড়ি ঝুলছে জেলের করাদের ভিতরের বৌটির মাথার উপর, তার স্বামী দাড়িয়ে আছে তার সামনে যে তাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে তার বৌদির হত্যার মিথ্যা দায়ে। আসলে হত্যাটি

করেছিলো স্বামীটির ভাই, মিথ্যা দায় দিয়ে জেলে পাঠানো হলো বউটিকে কারণ *বউ গেলে বউ পাওয়া যাবে, ভাই গেলে তো আর ভাই ফিরে আসবে না।* থমকে গেলাম পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নির্দোষ অসহায় নারীর আত্মবলিদান দেখে। মাকে জিজ্ঞেস করলাম এটার মানে কি, আমার মা উত্তর দিলেন, তখনকার সমাজে এভাবেই মেয়েদেরকে দেখা হতো, তারপর কিছুক্ষন চুপ করে থেকে আবার বললেন, এখনো যে আমাদের সমাজে তার খুব পরিবর্তন হয়েছে তা কিন্তু নয়! তারপর থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে অকারণে রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখাই পড়েছি, যতই পড়েছি, যতই নারী সম্পর্কে তার মতামতগুলো ঝালাই করে নিয়েছি; ততই পরিষ্কারভাবে বুঝেছি তার কাছে নারীমুক্তির সঙ্গায়িত রূপটি আসলে কি ছিলো।

একজন ঔপন্যাসিক বা সাহিত্যিক নাটক বা উপন্যাসে অনেক চরিত্র তৈরি করেন তার তার সৃষ্টিকে আকর্ষনীয় করে তোলার জন্য আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে। তাই একজন সাহিত্যিককে, বিশেষত রবীন্দ্রনাথকে, শুধুমাত্র তার নাটক বা উপন্যাস দিয়ে বিচার করা উচিত নয়, বিশেষত যখন তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তার মতামতগুলোকে খুব পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। ঠিক বুঝতে পারি না, কিছু লেখক রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলোকে 'লঘু' বা তাড়াহুড়ো করে লেখা প্রবন্ধ হিসেবে অভিহিত করে আলোচনার বাইরে রাখতে চান কেনো। একটি, দুটি প্রবন্ধ তো নয়, তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে, এগুলোকে 'লঘু' বা 'ফালতু' বলে উড়িয়ে দেওয়ার অবকাশ কোথায়? আমার তো মনে হয়েছে শত শত পৃষ্ঠা জুড়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা তার এই অনবদ্য সৃষ্টিগুলো তার একান্ত মনের কথা। এগুলো থেকেই তার চিন্তাধারা, মুল্যবোধ, ভাবনাগুলোকে পরিষ্কারভাবে বোঝা সম্ভব। সে যাই হোক, এখানে আমি শুধু প্রবন্ধগুলোতে রবীন্দ্রনাথের নারী বিষয়ক আলোচনাগুলোকে তুলে ধরবো - শুধুমাত্র সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতেই নয়, রবীন্দ্রনাথের নারী বিষয়ক চিন্তা ধারাকে বিশ্লেষণ করতে হবে সে সময়ের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা, আন্তর্জাতিকভাবে সারা বিশ্বে তখন কি ঘটছে, নারী আন্দোলনের তদানীন্তন অবস্থা, সমসাময়িক বিভিন্ন শ্রেনীর নারীরা, বুদ্ধিজীবি সাহিত্যিকেরা সে সম্পর্কে কিভাবে ভাবছেন, এই সব কিছুরই আলোকে। দেখা যাক তাহলে রবীন্দ্রনাথ নারী সম্পর্কে, নারী মুক্তি সম্পর্কে কি লিখেছেন তার প্রবন্ধগুলোতে।

মহারাষ্ট্রীয় নারীবাদী রমা বাই নারীমুক্তি নিয়ে বক্তৃতা দিতে মঞ্চে উঠলে তাকে আধাপথে থামিয়ে দেন 'পৌরুষদীপ্ত' শ্রোতৃগণ। পরবর্তীতে রমা বাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে লিখেন,

> *'কাল বিকেলে বিখ্যাত বিদুষী রমা বাই এর বক্তৃতার কথা ছিল, তাই শুনতে গিয়েছিলাম। ... তিনি বললেন, মেয়েরা সকল বিষয়ে পুরুষদের সমকক্ষ, কেবল মদ্যপানে নয়। তোমার কি মনে হয়। মেয়েরা সকল বিষয়ে যদি পুরুষের সমকক্ষ, তা হলে পুরুষের প্রতি বিধাতার নিতান্ত অবিচার বলতে হয়।'*

যেখানে বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথের অনেক আগে জন্মেও ১৮৭১ সালে বলতে পেরেছিলেন যে, '*স্ত্রী জাতি - সামাজিক নিয়ম দোষে পুরুষজাতির নিতান্ত অধীন - প্রভুতাপন্ন প্রবল পুরষজাতি, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া অত্যচার ও অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন, তাহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া সেই সমস্ত সহ্য করিয়া জীবনযাত্রা সমাধান করেন*'- সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীর এই অবস্থার জন্য দায়ী করেছেন প্রকৃতিকে। বলেছেন,

‘যেমন করেই দেখ প্রকৃতি বলে দিচ্ছে যে, বাইরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না। যদি প্রকৃতির সে রকম অভিপ্রায় না হত তা হলে মেয়েরা বলিষ্ঠ হয়ে জন্মাতো। যদি বল, পুরুষের অত্যাচারে মেয়েদের এই দুর্বল অবস্থা হয়েছে সে কোন কাজেরই কথা নয়। কেনো না গোড়ায় যদি স্ত্রী পুরুষ সমান বল নিয়ে জন্ম গ্রহন করতো তাহলে পুরুষদের বল স্ত্রীর উপর খাটতো কি করে।’

চলুন, আরও দেখি তিনি কি বলছেন এ প্রসঙ্গে,

‘নানা দিক থেকে দেখা যাচ্ছে সংসারের কল্যান অব্যাহত রেখে স্ত্রীলোক কখনও পুরুষের আশ্রয় ত্যাগ করতে পারে না। প্রকৃতি এই স্ত্রীলোকের অধীনতা কেবল তাদের ধর্মবুদ্ধির উপর রেখে দিয়েছে তা নয়, নানা উপায়ে এমনি আটঘাট বেঁধে দিয়েছেন যে সহজে তা থেকে নিষ্কৃতি নেই।’

তিনি পুরুষের পাশাপাশি মেয়েদের কাজ করার বিরোধিতা করে বলছেন,

‘নারী নারী বলিয়াই শ্রেষ্ঠ। তিনি পুরুষের কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে শ্রেষ্ঠতর হইবেন তাহা নহে, বরং বিপরীত ঘটিতে পারে, তাহাতে তাহাদের চরিত্রের কোমলতা, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার সমাঞ্জস্য নষ্ট হওয়া আশ্চর্য্য নহে।’

রবীন্দ্রনাথ এখানে স্পষ্ট করে বলছেন যে, প্রকৃতি নারীকে দুর্বল হিসেবে সৃষ্টি করেছে, এক্ষেত্রে পুরুষের যেমন কোন ভুমিকা নেই, তেমনি এর থেকে বের হয়ে আসার কোন পথও নেই, এই দাসত্ব নারীদের জন্মগত, প্রকৃতির বিধান। এধরনের অগুন্তি বক্তব্য দিয়েছেন তিনি ১৮৯০-থেকে ১৯৩০ এর মধ্যে। তাহলে চলুন এখন দেখা যাক তার সমসাময়িক কালের বাকি পৃথিবী কি বলছে, কি করছে তখন, এ প্রসঙ্গে। ঘরের ভিতর থেকেই শুরু করি .... রমা বাই যে পুরুষের সাথে সমানাধিকার চেয়েছেন তা আমরা আগেই দেখেছি, বিদ্যাসাগর কি বলেছেন তাও দেখলাম, বেগম রোকেয়া ১৯০৪ সালে বলেছেন মেয়েদের এই অবস্থা পুরুষতান্ত্রিক সমাজেরই তৈরি, প্রকৃতি প্রদত্ত নয়। রোকেয়াকে নিয়ে পরে আরেকট বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো বলে আপাতত তার প্রসংগ তোলা রইলো। এবার দেখি আন্তর্জাতিক আঙ্গনে কি ঘটছে এই সময়ে। পুঁজিবাদের বিকাশ হচ্ছে তখন এক অবিশ্বাস্য গতিতে, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় ইংল্যান্ড এবং ইউরোপে নারী স্বাধীনতার এক বিশাল উল্লম্ফন ঘটেছে, ছেলেরা যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় মেয়েরা দলে দলে বের হয়ে এসে হাল ধরেছে সব কিছুর, প্রমান করেছে নিজেদের যোগ্যতা বাইরের তথাকথিত পুরুষসুলভ কাজে। আমেরিকা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মেয়েরা তাদের সমান অধিকার এবং ভোটাধিকারের জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন। মেয়েরা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করছেন বিজ্ঞান থেকে শুরু করে সব ধরনের চ্যালেঞ্জিং কাজে। আর ওদিকে মার্ক্স, এঙ্গেলস এর সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব তখন দুনিয়া জুড়ে হইচই তুলেছে, ১৯১৭ তে রাশিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধিত হয়েছে, যেখানে সমাজে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা একটা গুরত্বপুর্ন পুর্বশর্ত। এঙ্গেলস বলছেন, পরিবার এবং ব্যক্তিগত মালিকানা সৃষ্টি হওয়ার ফলশ্রুতিতেই হাজার বছর আগে মেয়েরা হারিয়েছে তাদের আধিকার, কৃষি ব্যবস্থার

উদ্ভাবনের অবশ্যাম্ভাবি ফলাফল হিসেবে। তাহলে রবীন্দ্রনাথ এসবের কিছুই কি জানতেন না? তাও তো হতে পারে না, যে রবীন্দ্রনাথ আইনস্টাইনের মত মননের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন, মহাবিশ্বের রহস্য, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সুরের মুর্চ্ছনা নিয়ে গভীর আলোচনায় নিমগ্ন হয়েছেন, আমেরিকা, ইওরোপ, রাশিয়া সহ পৃথিবীর বহু দেশ চষে বেড়িয়েছেন, বিশ্ব ইতিহাস ঘেটেছেন এবং আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবিদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন সেখানে নারী-স্বাধীনতার মত এত বড় বিষয়টি তার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে তা একেবারেই অসম্ভব বলে মনে হয়। তিনি যে এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তা আসলে তিনি তো তার লেখাতেই বলেছেন, তিনি বলছেন যে চারদিকে নারী অধিকার নিয়ে যে শোরগোল চলছে তাকে তিনি ঠিক মনে করেন না :

> *'আজকাল একদল মেয়ে ক্রমাগতই নাকী সুরে বলছে, আমরা পুরুষের অধীন, আমরা পুরুষের আশ্রয়ে আছি, আমাদের অবস্থা অতি শোচনীয়। তাতে করে কেবল এই হচ্ছে যে, স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধবন্ধনহীনতা প্রাপ্ত হচ্ছে; অথচ সে-বন্ধন ছেদন করবার কোনো উপায় নেই। যারা অগত্যা অধীনতা স্বীকার করে আছে তারা নিজেকে দাসী মনে করছে: সুতরাং তারা আপনার কর্তব্য কাজ প্রসন্ন মনে এবং সম্পূর্ণভাবে করতে পারছেনা।'* (রমাবাই এর বক্তৃতা উপলক্ষে, জৈষ্ঠ ১২৯৬)

তাহলে রবীন্দ্রনাথ নারী প্রসঙ্গে যে কথা বলছেন তার ভিত্তিটা কোথায়। কোন দর্শনে বলা হয়েছে যে প্রত্যকটা মানুষ তার নির্দিষ্ট কর্মের সম্পাদনের জন্য এই পৃথিবীতে জন্মায়, তুমি যে কাজের জন্য জন্মেছো সেটাই তোমার ধর্ম, তোমার জাত নির্ধারণ করে দিয়েছে তোমার বিধাতা, সেই অনুযায়ী কর্তব্য পালন করাই তোমার একান্ত ধর্ম? ডঃ হুমায়ুন আজাদসহ অনেকেই রবীন্দ্রনাথের এই নারীমুক্তির বিরুদ্ধের অবস্থানকে ভিকটোরিয়ান ভাবধারা বলে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষন করলেই দেখা যাবে যে, তিনি যতখানি প্রভাবিত ছিলেন ভিকটোরিয়ান সামন্ততান্ত্রিকতা দিয়ে তার চেয়ে আসলে অনেক বেশি প্রভাবিত ছিলেন সনাতন হিন্দু ধর্মের সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়ে এবং উপনিষদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়ে। গীতা বলছে, তোমার জন্ম পুর্ব-নির্ধারিত, তুমি যে জাতে জন্মাবে সে জাতের কাজ করাই হচ্ছে তোমার ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের মুখে কি আমরা নারী সম্পর্কে প্রায় একই কথা শুনছিনা? প্রকৃতিই তোমাকে তৈরি করেছে দুর্বল করে, দাসী করে, এর বাইরে তুমি বেরুবে কি করে, এটাই তোমার ভাগ্য, এটাই তোমার ধর্ম, এই দাসত্বকে খুশি মনে মেনে নেওয়াতেই তোমার মংগল। তিনি তার পিতা প্রবর্তিত ব্রাহ্ম ধর্মের একজন অত্যন্ত অনুগত ছাত্র ছিলেন, প্রাচীন ভারতীয় দর্শন, উপনিষদের আধ্যাত্মিকতা এবং ভাববাদ তার ভিতরে অত্যন্ত গভীরভাবে গেড়ে বসেছিল।

তিনি *জাপানযাত্রী* প্রবন্ধে লিখছেন,

> *'এখানকার ঘরকন্নার মধ্যে প্রবেশ করে সব চেয়ে চোখে পড়ে জাপানি দাসী,। ... যেনো মানুষের সঙ্গে পুতুলের সঙ্গে, মাংসের সঙ্গে মোমের সঙ্গে মিশিয়ে একটা পদার্থ; আর সমস্ত শরীরে ক্ষিপ্রতা, নৈপুন্য, বলিষ্ঠতা। .... কিন্তু এটা দেখলেই বোঝা যায় এমন স্বাভাবিক আর কিছু নেই। দেহযাত্রার জিনিষটার ভার আদি থেকে অত্যন্ত পর্যন্তই মেয়েদের*

হাতে, এই দেহযাত্রার আয়োজন উদ্যোগ মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সুন্দর। কাজেই এই নিয়ত তৎপরতায় মেয়েদের স্বভাব যথার্থ মুক্তি পায় বলে শ্রীলাভ করে।'

তাহলে রবীন্দ্রনাথের ভুমিকাটি কি ছিল সেকালের নারী স্বাধীনতা আন্দোলনে? সমগ্র পৃথিবীতে যখন নারী স্বাধীনতা নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে, কয়েক হাজার বছরের গৃহবন্দী নারী যখন বাইরে বের হয়ে আসার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের পথে নিয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি নারীকে আটকে ফেলার চেষ্টা করছেন বহু শতকের পুরানো সামন্ততান্ত্রিক হিন্দু ধর্মের থাবার ভিতর। তিনি নারীদের এই সংগ্রামের প্রতি বন্ধুত্বের হাত তো বাড়িয়ে দেনই নি, তাকে পেছনের দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে টুটি চেপে বন্ধ করার পক্ষে কলম ধরেছেন। একে আর যাই বলা যাক নারী স্বাধীনতার সেবক বা নারীবাদ বলে চালিয়ে দেওয়া যায় না। নারীকে একদিকে যেমন যুদ্ধ করতে হচ্ছে তার শ্রেনী অবস্থান থেকে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক শোষনের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে তাকে আবার যুদ্ধে নামতে হচ্ছে তার শ্রেনীর এবং রবীন্দ্রনাথের মত এলিট শ্রেনীর পুরুষতান্ত্রিক পুরুষদের বিরুদ্ধে।

রবীন্দ্রনাথ তার চারপাশের এলিট বাঙ্গালী নারীদের দেখে লিখলেন সারাদিন গৃহে বন্দী থেকে আর বাচ্চা মানুষ করতে পেরেই বাঙ্গালী মেয়েরা যেন বর্তে গেছে। তাদের আর কোন স্বাধীনতারই দরকার নেই। তাই পাশ্চাত্যের নারীরা যে ঘর থেকে বাইরে পা রাখছে আর কাজ কর্ম করেছে সেটা তার কাছে অমঙ্গলসূচক মনে হয়েছে, মনে করেছেন আমাদের দেশের গৃহলক্ষ্মীরা এদের চেয়ে ঢের ভাল আছে। তাই তিনি বলেনঃ

'আমরা তো দেখতে পাই আমাদের দেশের মেয়েরা তাদের সুগোল কোমল দুটি বাহুতে দু-গাছি বালা পরে সিথের মাঝখানটিতে সিঁদুরের রেখা কেটে সদা প্রসন্ন মুখে স্নেহ প্রেম কল্যাণে আমাদের গৃহ মধুর করে রেখেছেন। ... যা হোক আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের নিয়ে আমরা তো বেশ সুখে আছি এবং তারা যে বড় অসুখী আছেন এমনতর আমাদের কাছে তো কখনও প্রকাশ করেন নি, মাঝের থেকে সহস্র কোড় দুরে লোকের অনর্থক হৃদয় বিদীর্ন হয়ে যায় কেনো? .....

এখানে কথা হচ্ছিল, আমাদের স্ত্রীলোকেরা সুখী কি অসুখী। আমার মনে হয় আমাদের সমাজের যে রকম গঠন, তাতে সমাজের ভাল মন্দ যাই হোক আমাদের স্ত্রী লোকেরা বেশ এক রকম সুখে আছে।' (প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, ১২৯৮)।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের চোখে 'সুখী বাংলার নারী' মানে হচ্ছে 'দু-গাছি বালা পরে গৃহ মধুর করে রাখা' যেমনটি রেখেছিলো তার উঁচু তলার দিদি, বৌদি, জায়া আর কন্যারা। তিনি বোঝেননি যে, বাংলার ৯৫% এর বেশী নারীই তার এই ব্যাখ্যার মধ্যে পড়ে না। বাংলার গ্রামের মেয়েরা কেবল দু-গাছি বালা পরে গৃহ উজ্জ্বল করে রাখেনি বরং অনাদিকাল থেকেই ক্ষেতে খামারে কাজ করেছে পুরুষের পাশাপাশি, ইট ভেঙে-ছে, ধান ভেনেছে ; তিনি এতো কিছু লিখেছেন এতো বিষয় নিয়ে কিন্তু কোথাও কখনও বেগম রোকেয়ার কথা বলেননি, প্রীতিলতার কথা আনেননি।

রমা বাইয়ের প্রসংগ আগে এসেছে, আবারো বলছি - তিনি নারীদেরকে পুরুষের সমকক্ষ হিসেবে দাবী করেছিলেন, আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথ কিভাবে তার বিরোধিতা করেছেন। এবার তাহলে দেখা যাক সমসাময়িক কালে বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) কি বলছেন নারীদের অবস্থান এবং নারীমুক্তি নিয়ে, তার সাথে রবীন্দ্রনাথের নারী দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য কোথায়। রোকেয়া ১৯০৪ সালে বলছেন,

> 'আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্যই পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশ পত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন', তিনি আরও বলছেন, 'ধর্ম শেখে আমাদের দাসত্বের বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়াছে; ধর্মের দোহাই দিয়া পুরুষ এখন রমনীর উপর প্রভুত্ব করিতেছেন।'

তিনি এখানে কোন বিশেষ ধর্মের কথা বলেননি, বলেছেন সব ধর্মের কথাই, তিনি এখানে নারীদের দাসত্বের প্রতিবাদ করেছেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ নারীমুক্তির দাবীকে সম্পুর্নভাবে বাতিল করে দিয়ে মেয়েদের দাসত্বকে তাদের সনাতন ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে উঠে পরে লেগেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, বেগম রোকেয়ার ঠিক বিপরীতে দাঁড়িয়ে, সামন্ততান্ত্রিক পুরষতন্ত্রের পুরাধা এবং রক্ষক হয়ে,

> 'অতএব আজকাল পুরুষাশ্রয়ের বিরুদ্ধে যে একটা কোলাহল উঠেছে সেটা আমার অসঙ্গত এবং অমঙ্গলজনক মনে হয়। পূর্বকালে মেয়েরা পুরুষের অধীনতাগ্রহনকে একটা ধর্ম মনে করত; তাতে এই হত যে, চরিত্রের উপর অধীনতার কুফল ফলতে পারত না, অর্থাৎ হীনতা জন্মাত না, এমনকি অধীনতাতেই চরিত্রের মহত্ত্ব সম্পাদন করত। প্রভুভক্তিকে যদি ধর্ম মনে করে তাহলে ভৃত্যের মনে মনুষ্যত্বের হানি হয় না।' (রেফারেন্স : রমাবাঈ এর বক্তৃতা উপলক্ষে, জৈষ্ঠ ১২৯৬)।

যিনি মেয়েদের নিতান্ত গৃহভৃত্যের সাথে তুলনা করে বলেছেন, 'প্রভুভক্তিকে যদি ধর্ম মনে করে তাহলে ভৃত্যের মনে মনুষ্যত্বের হানি হয় না' তাকে মনে-প্রাণে এত 'আধুনিক বা নারীবাদী বা 'pro-women' ভাবি কি করে? রোকেয়া যখন আমাদেরকে ধর্মের রূপ উন্মোচন করে দেখাচ্ছেন ধর্ম নারীজাতিকে শৃংখলিত করেছে, তখন রবীন্দ্রনাথ আমাদেরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন হাজার বছরের পুরনো সামন্ততান্ত্রিক আত্যাচারী পুরষতান্ত্রিক প্রাচীন ভারতীয় দর্শন আর উপনিষদের দিকে। দাসত্বই নারীর ধর্ম তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাউকে নারীবাদী হতে হয় না, হাজার বছর ধরে পুরুষ সমাজ ব্যবস্থা সেই দায়িত্ব সুচারুভাবে সম্পাদন করে এসেছে। রোকেয়া থেকে শুরু করে, ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস পর্যন্ত যখন সঠিকভাবেই নারীর এই হাজার বছরের দুর্দশার জন্য পুরুষতান্ত্রিক সামজব্যবস্থাকে দায়ী করছেন, তখনও দেখি রবীন্দ্রনাথ ঠিক উলটো সুর তুলেছেন,

> '' প্রকৃতিই নারীকে বিশেষ কার্যভার ও তদানুরূপ প্রবৃত্তি দিয়া গৃহবাসিনী করিয়াছেন – পুরুষের সার্বভৌমিক স্বার্থপরতা এবং উৎপীড়ন নহে ...'।

রবীন্দ্রনাথ যখন তার হাজার বছরের সামন্ততান্ত্রিক ধারণা থেকে নারীর দুর্বলতাকে প্রকৃতির বিধান বলে চালিয়ে দিচ্ছেন, তখন রোকেয়া বলছেন,

'আমরা পুরুষের ন্যায় শিক্ষা অনুশীলনের সম্যক সুবিধা না পাওয়ায় পশ্চাতে পড়িয়া আছি। সমান সুবিধা পাইলে আমরাও কি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিতাম না? আশৈশব আত্মনিন্দা শুনিতেছি, তাই এখন আমরা অন্ধভাবে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করি এবং নিজেকে অতি তুচ্ছ মনে করি।' (রোর, ৪৩ - ৪৪)।

সুতরাং একথা বলার অবকাশ আর কোথায় থাকে যে, রবীন্দ্রনাথ তার সময় অনুযায়ী নারীকে দেখেছেন, তিনি তো আসলে সময়ের দাবির চেয়ে অনেকখানি পিছিয়ে ছিলেন এ প্রসংগে। ১৯০০ সালের গোড়ায় এসে নারীরা যখন এই শৃঙ্খল থেকে বেড়িয়ে আসার জন্য ছটফট করছে, রমা বাই, রোকেয়ারা অসীম সাহস নিয়ে তার বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর চেষ্টা করছে, তখন তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়াটয়াকে আর যাই বলুন না কেনো প্রগতিশীল নারীবাদী ভুমিকা বলে দাবী করা যায় না। এই দাবীটা শুধু হাস্যকরই নয়, এর মাধ্যমে আসলে নারীজাতির প্রতি, হাজার বছরের নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের এই যুদ্ধের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয়।

অনেকে বলছেন রবীন্দ্রনাথ নারী স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন কি ছিলেন না সেটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে কেনো, একজন সাহিত্যিক হিসেবে কি লিখেছেন বা করেছেন তা নিয়ে আলোচনা হবে, কি করেন নি সেটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করাটা অপ্রয়োজনীয়। আসলে আরেকটি খাঁটি কথা বলছেন তারা। রবীন্দ্রনাথ যদি তখনকার এই অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ বিষয়টি নিয়ে কিছুই না বলতেন তাহলে এই যুক্তি হয়তো প্রযোজ্য হতো তার জন্য, কিন্তু যেখানে তিনি এতো সক্রিয়ভাবে তার লেখার মাধ্যমে নারী স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছেন সেখানে তো তার দায় তাকে নিতেই হবে, তার যথাযোগ্য পর্যালোচনাও হতে হবে। তবে এ কথা কোন মতেই অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে তিনি নারীকে আবার শ্রদ্ধার সাথে 'কল্যানীয়া' হিসেবে দেখেছেন, তাদেরকে তার দেখা অন্তঃপুরের নারীদের মতই শাখা সিদুঁর পরে সুখে রাখার স্বপ্ন দেখছেন, শিক্ষার আলো দিতে চেয়েছেন। তার মন কেঁদেছে তদানিন্তন সমাজের নারীদের দুর্দশা দেখে। কিন্তু যে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের মধ্য দিয়ে নারীর এই অবস্থা থেকে মুক্তি ঘটতে পারে তার তিনি তীব্র বিরোধিতা করেছেন। নারীর প্রতি তার এই সহানুভুতি এবং ভালোবাসা যেনো এক প্রশ্রয়দাতার করুনা, যা দিয়ে নারীর জীবনের কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়, নারী মুক্তি বা স্বাধীনতার আন্দোলনে এর কোন ভুমিকা নেই। এখানেই হয়তো রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পাশ্চাত্যের ভিকটোরীয় দৃষ্টিভঙ্গীর ছোঁয়া দেখতে পাওয়া যায়।

এবার দৃষ্টি ফিরানো যাক নারীশিক্ষা বিস্তারের প্রতি তার কি দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো তার প্রতি। অনেকেই খুব নিদারুনভাবে নারী শিক্ষার সাথে নারী মুক্তির ইস্যুটা গুলিয়ে ফেলছেন। আগেই বলেছি, নারী শিক্ষা বিস্তারে কাজ করা আর নারী মুক্তির জন্য কাজ করা দুটো দুই জিনিষ। তিনি নারীশিক্ষার প্রসারের জন্য কাজ করেছেন, এ ব্যাপারে সে সময়ের 'স্ট্যটাস কো' বজায় রেখেছেন, নারীকে শিক্ষিত করার আন্দোলন রবীন্দ্রনাথের আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিলো, তিনি তাকে সমর্থন করেছেন ততক্ষন পর্যন্তই যতক্ষন নারীকে দুর্বল এবং পুরুষের অধীন করে রাখা গেছে, এর থেকে বেশী কিছু চাইলেই তিনি তার প্রবল বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলছেন,

স্ত্রীলোকের বুদ্ধি পুরুষের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প বলে অবশ্য এ কথা কেউ বলবে না যে, তবে তাদের লেখাপড়া শেখানো বন্ধ করে দেওয়া উচিত।'

স্ত্রীলোকের বুদ্ধি কম, তাদের এই স্বল্প বুদ্ধি নিয়েই তারা যদি উপযুক্ত গৃহলক্ষ্মী হওয়ার জন্য লেখাপড়া করে তাহলে মন্দ হয় না। তিনি আর সবার মতই মেয়েদের শিক্ষা দিতে চেয়েছেন মেয়েদেরকে শিক্ষিত মা, দিদি, গৃহলক্ষ্মী বানানোর জন্য, তাদেরকে পুরুষের সমকক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য নয়, বাইরের জগতে বেড়িয়ে আসার জন্য নয়, নারীর এই শিক্ষা নারীর জন্য নয়, পুরুষের দরকারেই তার প্রয়োজনকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি বেগম রোকেয়ার মত বলেননি,

> *'কন্যা গুলিকে সুশিক্ষিত করিয়া কার্জক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজেরা অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক'।*

১৮৯১ সালে কৃষ্ণভাবিনী দাস নারী শিক্ষার পক্ষে একটি প্রবন্ধ লিখলে তার সাথে বিতর্ক করার সময় রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেন,

> *'প্রকৃতিই নারীকে বিশেষ কার্যভার ও তদানুরূপ প্রবৃত্তি দিয়া গৃহবাসিনী করিয়াছেন – পুরুষের সার্বভৌমিক স্বার্থপরতা এবং উৎপীড়ন নহে – অতএব বাহিরের কর্ম দিলে তিনি সুখীও হইবেন না, সফলও হইবেন না।'*

পাঠকেরা, লক্ষ্য করুন কত সারাসরিভাবেই তিনি মেয়েদের অন্তপুর থেকে বের হয়ে আসার বিরোধিতা করেছেন এখানে। অথচ এমন নয় যে, তখনও কোন নারী বাইরে কাজ করতে বের হন নি। নিম্নবিত্ত এবং গ্রামীন নারীদের কথা না হয় বাদই দিলাম, এমনকি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের কিছু মেয়েও তখন কর্মক্ষেত্রে বেড়িয়ে পড়েছেন। হুমায়ুন আজাদের নারী বইয়ের পরিসঙ্খ্যান আনুযায়ী, দেখা যাচ্ছে, ১৯০১ সালে কোলকাতায় বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত নারীর সংখ্যা ছিলো ৭২৫ জন। ১৮৬৩ সালে ২১ বছরের তরুনী বামাসুন্দরী দেবী প্রতিষ্ঠা করেন একটি বালিকা বিদ্যালয়, নানা রকম অসুবিধার সম্মুখীন হয়েও ব্রাহ্ম মনোরমা মজুমদার বরিশালে শিক্ষকতা শুরু করেন, ১৮৬৬ সালে রাধামনি দেবী শেরপুর বালিকা বিদ্যালয়ে চাকরী শুরু করেন..... তাহলে দেখা যাচ্ছে, এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের ভুমিকা আগ্রসর তো নয়ই, তিনি যে নারীরা ইতিমধ্যেই সমাজের প্রবল বাঁধা অতিক্রম করে ঘরের বাইরে বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন তাদেরকে তো সমর্থন করেনই নি, তাদের বিরুদ্ধেই বরং কলম ধরেছেন। যে রবীন্দ্রনাথের মাহাত্ম্য খোঁজা হয় 'বৌয়ের গয়না বেঁচে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা' করার মধ্যে, তার মধ্যে আর যাই থাকুক নারীমুক্তির কোন আলামত নেই এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়, মানবতা বলে কোন কিছু থাকলেও হয়তো থাকতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ থেকে বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র থেকে এমনকি আজকের গোলাম আজমরাও পর্যন্ত সবাই মেয়েদের শিক্ষার কথা বলে! ইংরেজি কায়দায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ছেলেদের জন্য শিক্ষিত মেয়ে বিয়ে করা তখন প্রয়োজনীয় হয়ে দাড়িয়েছে। শিক্ষিত বৌ বিয়ে করা একটা ফ্যাশন, তাই চাকরী পেয়েই সে পণ করে- 'যে করিয়াই হৌক এইবার শিক্ষিত মেয়ে বিবাহ করিব।' মেয়েদের বিশেষত নিজের বৌকে সবার কাছে সুবেশিত ভাবে উপস্থাপন করতে পুরুষ গর্ব বোধ করে। রবীন্দ্রনাথও সেরকম ভাবেই মেয়েদের উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের শিক্ষা চান, তবে সবার জন্য সার্বজনীন শিক্ষা চাননি, কেবল সেই শিক্ষাই চেয়েছিলেন যেটি মেয়েদের পুতুল বানিয়ে রাখবে। তাই তিনি স্ত্রী শিক্ষা প্রবন্ধে পরিস্কার করেই বলেন :

'মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপর মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা, তার একটা বিশেষত্ব আছে।'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই নারীবিরোধী অবস্থানের কিছুটা পরিবর্তন দেখতে পাই তার শেষ বয়সে লেখা নারী প্রবন্ধে। হুমায়ুন আজাদ সে সম্পর্কে সঠিকভাবেই বলেছেন, 'প্রবন্ধটিতে পাই দুই রবীন্দ্রনাথকেঃ এক রবীন্দ্রনাথ পিতৃতান্ত্রিক, যিনি নারীকে মনে করেন প্রকৃতির অভিপ্রায় বাস্তবায়নের মাংসল যন্ত্র, যার কাজ সন্তান ধারণ পালন, যে বইছে 'আদি প্রনায়ের সহজ প্রবর্তনা' নিজের স্বভাবের মধ্যে; আরেক রবীন্দ্রনাথ, অনেকটা বাধ্য হয়ে মেনে নেন যে নারীকে বেড়িয়ে আসতে হবে বাইরে। যে নারী কল্যানী হয়ে থাকতে চান না, তাদের আমন্ত্রনে তাদের সম্মেলনে এসে রবীন্দ্রনাথ তাদের সম্পুর্ন বিরুদ্ধে বলবেন, এরকম আরুচিকর স্বভাব ছিলো না তার। তিনি খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেন কর্মমুখর নারীদের সাথে। কৃতজ্ঞ বোধ করছি নিখিলবংগ- মহিলা কর্মীদের প্রতি, কেনোনা তারা নিজেদের সভায় আমন্ত্রন করে উদ্ধার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। তারা রবীন্দ্রনাথে আমন্ত্রন না জানালে তার তিরোধান ঘটতো নারীমুক্তি বিরোধী পুরুষতন্ত্রের এক বড় পুরোহিত রূপে; আমন্ত্রিত হয়ে রূপান্তরিত হন রবীন্দ্রনাথ, কাটিয়ে ওঠেন নিজের আযৌবন প্রগতিবিরোধিতা, স্বীকার করে নেন নারীমুক্তিকে, অনেকটা বাধ্য হয়ে। নারীরাই সৃষ্টি করেন এক নতুন রবীন্দ্রনাথকে, যখন তার বয়স পচাত্তর। যে-নারীমুক্তি একদিন তার কাছে ছিলো অপ্রকৃতস্থ ভুলপ্যাককরা একদল নারীর আস্ফালন, তা এখন তার কাছে হয়ে ওঠে অনিবার্যঃ

এ দিকে প্রায় পৃথিবীর সকল দেশেই মেয়েরা আপন ব্যক্তিগত সংসারের গন্ডি পেড়িয়ে আসছে। আধুনিক এসিয়াতেও তার লক্ষন দেখতে পাই। তার প্রধান কারন সর্বত্রই সীমানা-ভাঙ্গার জুগ এসে পড়েছে। .... বাহিরের সঙ্গে সংঘাতে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, নূতন নূতন প্রয়োজনের সঙ্গে আচার-বিচারের পরিবর্তন অনিবার্জ হয়ে পড়েছে'(নারী, ৩৭৯-৩৮০)।

একটা জিনিষ খেয়াল করুন পাঠকবৃন্দ, রবীন্দ্রনাথ সব সময় তার সময়ের থেকে পিছিয়ে থেকেছেন, রোকেয়া, রমা বাই, এমনকি বিদ্যাসাগররা যে কথা বলেছেন প্রায় অর্ধ শতক আগে আজকে ১৯৩৬ সালে এসে তিনি তিনি তাকে স্বীকার করে নিচ্ছেন, একরকম বাধ্য হয়েই, নারীরা সেই অধিকার কিছুটা হলেও প্রতিষ্ঠা করে ফেলার পর। তাহলে তিনি প্রগতিশীল বা নারীবাদী হলেন কিভাবে?

তিনি এই প্রবন্ধেই মেয়েদের এতো দশকের নারী আন্দোলনকে অস্বীকার করে বলছেন,

' কালের প্রবাহে মেয়েদের জীবনের ক্ষেত্র এই যে সুতই প্রসারিত হয়ে চলেছে, এই যে মুক্ত সংসারের জগতে মেয়েরা আপনিই চলে এসেছে, এতে করে আত্মরক্ষা এবং আত্ম সম্মানের জন্য তাদের বিশেষ করে বুদ্ধি চর্চা, একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠলো।'

তাহলে কি মেয়েদের এই অধিকার এমনি এমনি চলে আসলো, নাকি পুরুষেরা তাদেরকে উপহার দিলো প্রভু হিসেবে? নারীরা এই অধিকার সত্ত্বই বা আপনা আপনি পান নি, বিশ্বজুড়ে নারীদের আন্দোলন করতে

হয়েছে এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, এমনকি রবীন্দ্রনাথের সামন্ততান্ত্রিক পুরষতন্ত্রের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে হয়েছে তাদেরকে। আমরা সারা বিংশ শতাব্দী ধরেই দেখেছি নারীদের আন্দোলন করে যেতে, যা এখনও আমরা করে চলেছি এই সমাজব্যবস্থায়, তাদের উত্তরসুরী হিসেবে পুরোদমে।

এখন হয়তো অনেকে বলে উঠবেন নারীবাদ না জেনে, রবীন্দ্রনাথের গভীরে না যেয়ে বা ভাসা ভাসা জেনে আমি কোন সাহসে এতো বড় বড় কথা লিখে ফেললাম, কেনো! হুমায়ুন আজাদের মত রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ এবং নারীবাদী লেখককে যখন কেউ তুড়ি মেরে গ্যলারী লেখক, childish, shallow বলে উড়িয়ে দিতে পারেন তখন আমি তো কোন নস্যি। তার কোন বই না পড়ে, তার সারা জীবনের গবেষনার কাজ সম্পর্কে কিছুই না জেনে তাকে এভাবে উড়িয়ে দেয়াটাকে কি ধৃষ্টতার পর্যায়ে ফেলবো নাকি অজ্ঞতা বলে উড়িয়ে দেবো তা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না, হুমায়ুন আজাদের সাথে আমরা দ্বিমত পোষন করতে পারি, কিন্তু তার পান্ডিত্যকে তো অস্বীকার করতে পারি না। *নারী* বইটি একটি ঐতিহাসিক দলিল, শুধু বাংলা ভাষায় নয়, আন্তর্জাতিকভাবেও খুব কম বইই এভাবে সারা বিশ্বের নারীদের অবস্থানকে, তাদের আন্দোলনকে এত সুচারুভাবে দলিলবদ্ধ করতে পেরেছে। বিশ্বায়নের এই যুগে যখন কেউ বলেন মেরী কে বোঝার আগে আমাদের নিজের নারীকে বুঝতে হবে তখন হোচট খাই। নিজের নারীকে বোঝার অর্থটা কি? রবীন্দ্রনাথ যেভাবে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের নারীর পার্থক্য করেছেন, দু' দলের জন্য দুই দাওয়াই বাৎলে দিয়েছেন, তারা কি সেই দাওয়াইয়ের কথা বোঝাচ্ছেন, তারা কি রবীন্দ্রনাথের মত উচ্চ মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত নারীকে প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিকতার মোড়কে পুড়ে বিচার করতে বলছেন? নারী মুক্তি আজকে নারীর স্বল্পবুদ্ধি, ছোট ব্রেন কিংবা কোমল হাত, শুন্য বা ভরা কোল, মান আভিমান, অশ্রুজলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, একটি দেশের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা এবং তাতে একটি মেয়ের শ্রেনী অবস্থান কি তার উপর নির্ভর করবে নারীমুক্তির ভবিষ্যত, রাবীন্দ্রিক উপায়ে নারীকে মিস্টিক সামন্ততান্ত্রিক দাসীর আলোকে বিচার করে মনে হয় না আর কোন লাভ হবে।

কবি ইয়েটস প্রথম জীবনে রবিন্দ্রনাথকে অত্যন্ত প্রশংসনীয় দৃষ্টিতে দেখলেও পরবর্তিতে তার মতামত পরিবর্তন করেন। বার্টান্ড রাসেলের মত অত্যন্ত প্রগতিশীল দার্শনিকও তার দর্শনের তীব্র সমালোচনা করে বলেছিলেন :

> 'I regret I can not agree with Tagore. His talk about the infinite is vague nonsense. The sort of language that is admired by many Indians unfortunately does not, in fact, mean any thing at all.'

হাঙ্গেরিয়ান সাহিত্যিক লুকাস রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করে বলেছিলেন :

> 'Tagore speaks of the "Heavenly Kingdom", "almighty God" and "Soul". If these could remove us from misery what would be the use of man's endevour to reform the world? We oppose D. Tagore, who tries to stunt the growth of self-determination and the struggle of oppresed classes and races.'

পৃথিবীতে সব বড় এবং মহান ব্যক্তিত্বের সমালোচনা হয়েছে, সব সমাজে, সব দেশে। রবীন্দ্রনাথ তো শুধু একজন কবি বা সংগীতকার বা ঔপন্যাসিক নন, তিনি বাঙ্গালির সাহিত্য, সংস্কৃতি, চিন্তা- চেতনায় জুড়ে আছেন, তার যথাযোগ্য সমালোচনা হলেই তার সম্পর্কে আমরা সঠিক মুল্যায়নে আসতে পারবো। বুঝতে পারি না, তাকে পুজোর বেদীতে উঠিয়ে রাখার এতো তীব্র প্রচেষ্টা কেনো চারদিকে। রবীন্দ্র সমালোচনাকে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি হিসেবে ভালো ছিলেন কি খারাপ ছিলেন তার বাইরে নিয়ে যেতে হবে। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ এখানে কোন বিষয়বস্তু হতে পারেনা, অর্ধ-শতকের বেশী ধরে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে তিনি যে আবদান রেখে গেছেন তাকে এক কথায় ভালো বা খারাপ বলে বিচার করলে তার প্রতি আবিচার করা হয়। বাঙ্গালীদের উপর তার প্রভাব যেমন বিশাল, তেমনি অকল্পনীয় তার ব্যাপ্তি। রবীন্দ্রনাথকে আজকে বিচার করতে হবে তার সাহিত্য দিয়ে, দর্শন দিয়ে, তার রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক চিন্তা দিয়ে, নারী, শিক্ষা, ভারতীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে - এর সব কিছুকেই আলাদা আলাদাভাবে মুল্যায়ন করতে হবে। তার দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা, মুল্যবোধের সমালোচনা মানে এই নয় তার ব্যাপ্তিময় অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। এখানেই বোধ হয় চলে আসে পুজার ব্যাপারটি, যার পুজা বা এবাদত করা হয় তার কোন সমালোচনা করা যাবে না, এভাবেই তো ভাবতে শিখিয়েছে আমাদের চিরন্তন সমাজ ব্যবস্থা এবং ধর্ম, আমাদের আর কি দোষ! প্রথার জগদ্দল পাথর সেই অনাদিকাল থেকেই মাথায় চেপে বসেছে, খুব কম লোকই পারে সেখান থেকে বের হয়ে আসতে।